উপসংহার

উপসংহার

মনোজ মিত্র নিজেকে গণনাট্য ধারার উত্তরসূরী বলতে গর্ব বোধ করেন, কিন্তু গণনাট্য সংঘ যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়ে গেছে তাকে চালাকি করে খাটানোকে সমর্থন করতে পারেন নি। বাংলা নাটক ও থিয়েটারে সমকালে এই চালাকির ব্যবহার দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। স্পষ্ট বলেছেন ঃ

> ''চালাকিটা এখানেই যে আমরা বুঝতে পেরে গেছি, কি জিনিস দিলে মানুষ নেবে, নাটকে কি জিনিস থাকলে তা বহুলোককে টানবে, বহুলোকের বাহবা কুড়োনো যাবে। তাতে আমরা বিশ্বাসী হই বা না হই, তাকে আমরা চিনি বা না চিনি। আমরা আমাদের ছক জানি, আর জানি তত্ত্ব। এই দুটোকে আমরা মিলিয়ে ছেড়ে দিই।''[১]

নিজের নাটকে এই চালাকি করবেন না বলে মনোজ মিত্র উপস্থিত করলেন চোখে দেখা জগৎকে, নিজের চেনা মানুষ এবং পরিবেশকে। যে মানুষদের তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর প্রথম নাটক থেকে শুরু করে পরবর্তী সবগুলি সৃষ্টিতে তারা সবাই তাঁর অভিজ্ঞতার জগতের অধিবাসী। তাদের লোভ-ক্ষুধা-দারিদ্র্য, দুঃখ-হাসি-কান্না প্রভৃতি সবই তাঁর অতিপরিচিত। সেই পরিচিত মানুষকে দোষ-গুণ, ভাষা-আচরণসহ উপস্থিত করলেন তিনি।

মনোজ মিত্রের নাট্যকর্মের সামগ্রিক আলোচনার পর কতগুলি বিষয় আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, নিজের নাটকের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন দেশীয় ভূমি থেকে। পাশ্চাত্য বিভিন্ন নাট্যকলা সম্পর্কে অবহিত থেকেছেন, কিন্তু দেশীয় নাট্যকলাই তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয়। এই নাট্যকলার চর্চা ও সংরক্ষণে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। পাশ্চাত্য রীতির দ্বারা কখনো প্রভাবিত হ'লেও তাকে ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ দেশীয় অনুষঙ্গে। দ্বিতীয়ত, তাঁর নাটকের বিষয় মূলত সামাজিক। সামাজিক বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য তিনি কখনো ইতিহাসের পটভূমি ব্যবহার করেছেন, কখনো পুরাণকে আশ্রয় করেছেন, কখনো রূপকের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন, কখনো বা সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর নাটকে একদিকে যেমন আছে মানবিকতার প্রবল অভিঘাত, অন্যদিকে পাই সামাজিক নানা কলুষের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশ। সেই আক্রোশকে একটা তত্ত্বচেতনায় গড়ে তোলার চেষ্টা এবং সামাজিক সমস্যা ও সংকট দূরীকরণে তাঁর নিজস্ব ভাবনা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দৃঢ়। তৃতীয়ত, নিজের নাটকে তিনি প্রধানত দেখাতে চেয়েছেন বহু বিচিত্র মানুষকে। মানুষের ভেতরকার মানুষ — যে মানুষ অসংখ্য বৈপরীত্যের সমবায়ে সম্পূর্ণ — সেই মানুষই তাঁর অবলম্বন। এই মানুষেরা বেশিরভাগই প্রান্তিক মানুষ, অসহায় মানুষ, দারিদ্র্য-লোভ-ধূর্ততায় মিশ্রিত মানুষ, ছেঁড়া মানুষ। নিজের নাট্যজীবনে তিনি এঁদের নিয়েই কাজ করেছেন। তাঁর নাটকে এইসব মানুষদের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করেছেন চন্দন সেন ঃ

> ''মনোজ মিত্রের নাটকীয় তন্তুজালে ঘটনা-উপঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কত কালোচিত বৈচিত্র্য এল, — কিন্তু লৌকিক-অলৌকিক, বাস্তব-পরাবাস্তবের মাঝখান থেকে হাঁটতে থাকা এইসব গাঁয়ের মাটি কিম্বা শহুরে ধুলো লেগে থাকা মানুষগুলোর অপ্রাপ্তি আর হাহাকার, নিঃসঙ্গতা আর বিচ্ছিন্নতার খুব বেশি অদলবদল হোল কি ? হয়তো মনোজ মিত্র এই ভীষণ ব্যস্ত, ধূর্ত, কুচুটে সময়েও ঐ একটা লেখারই চেষ্টা করে চলেছেন।''[২]

সেই লেখাটি হ'ল মানুষের জীবনপিপাসার উচ্চারণ – সব প্রতিকূলতাকে সরিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবার প্রত্যয়। চতুর্থত, দীনবন্ধু মিত্রের মতো মনোজ মিত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য 'সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি'। এই সহানুভূতি যেমন বর্ষিত হয়েছে নায়ক চরিত্রের প্রতি, তেমনি খলচরিত্রও তা থেকে বঞ্চিত হয় নি। তাঁর নায়ক যেমন সর্বগুণের আধারমাত্র নয়, ভিলেনও তেমনি দোষের আকর নয়। একাধিক প্রেক্ষণ-বিন্দু ব্যবহার করে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো মুহূর্তে অসহায়। পঞ্চমত, মনোজ মিত্র আধুনিক নগরজীবনে বাস করলেও অন্তরে লালন করেছেন শৈশবের একান্নবর্তী পরিবার এবং গ্রামজীবনের প্রতি মমতা। আধুনিককালের অনিবার্য পরিবর্তনকে তিনি অস্বীকার করেন নি, নিজের নাটকে সেই পরিবর্তনের চিত্রও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারাশঙ্করের মতোই পুরনোর জন্য তাঁর দীর্ঘশ্বাসটি গোপন থাকে নি। ষষ্ঠত, সমাজ এবং পরিবারে যে কোনো মূল্যে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান মনোজ মিত্র। তিনি দেখেছেন, আধুনিক জীবনে মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটেছে। কেবল সেই অবক্ষয়ের চিত্রাঙ্কনেই শেষ হয় না তাঁর নাটক। কীভাবে তার নিরসন সম্ভব – সে বিষয়েও তাঁর নির্দিষ্ট ভাবনা প্রকাশ পায়। সপ্তমত, আঙ্গিকের দিক থেকে যেমন তিনি একাঙ্ক ও বহুঅঙ্কবিশিষ্ট নাটক রচনা করেছেন, তেমনি রীতির দিক থেকে গণনাট্য, নবনাট্য, এপিক থিয়েটার, দেশজ নাট্যকলা প্রভৃতির ব্যবহারে একধরণের Composite নাট্যরচনা-রীতি উদ্ভাবন করেছেন।

মনোজ মিত্রের নাটকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির উত্তাপ কম। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কোনোদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সেভাবে যুক্ত থাকেন নি। তবে তাঁর কোনো কোনো নাটকে, বিশেষত প্রথম দিককার নাটকে শোষক-শোষিতের যে সংগ্রাম এবং পরিণামে শোষিতের জয় দেখানো হয়েছে তা বিশেষ রাজনৈতিক তত্ত্বেরই পরিপোষক। এই পর্বে তিনি মূলত ক্রোধী। কিন্তু ক্রমে তাঁর নাটকে রচনারীতির বদল ঘটতে থাকে। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিকতার পরিবর্তে তিনি বেছে নেন রূপকের আবরণ, Epic form বা ফ্যান্টাসির আবহ। তাঁর নাটকে রাজনীতির উপস্থিতির ধরণটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক কুমার রায় লিখেছেন ঃ

> "Political issues are not directly dealt with Manoj and Mohit's plays, but both weave elaborate fantasies or imageries to carry a political message which are more often liberal humanist than overtly marxist."[৩]

এই উদার মানবতাবাদ যখন যে রাজনীতির দ্বারা আক্রান্ত বা ধ্বস্ত হয়েছে, তখন সেই রাজনীতিই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। কাউকেই তিনি ছেড়ে কথা বলেন নি। বিশেষ কোনো দলীয় আনুগত্যের দায় নেই বলে সত্যভাষণে তিনি অকুন্ঠিত।

নাটক রচনায় মূলত কমেডির ধাঁচ ব্যবহার করেছেন মনোজ মিত্র। যদিও প্রথম দিকে serious বক্তব্যের নাটক দিয়েই তাঁর পথ চলা শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে রচিত নাটকগুলিতে পরবর্তীকালের 'সিরিয়োকমিক' নাট্যকার মনোজ মিত্রের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। 'কেনারাম বেচারাম' বা 'পরবাস'-এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি একদিকে গণনাট্যের তত্ত্বভাবনার পথের পথিক ('নেকড়ে', 'চাক ভাঙা মধু', 'কালবিহঙ্গ'), অন্যদিকে ব্যক্তি সমস্যার রূপদানকারী ('মৃত্যুর চোখে জল', 'পাখি', 'টাপুর টুপুর') কিংবা পুরাণ-নির্ভর ('অশ্বত্থামা', 'তক্ষক')। তাঁর নাট্যরচনার প্রাথমিক পর্বটিকে সমালোচক

চিহ্নিত করেছেন এভাবে ঃ

"In the begining Manoj's plays (in the Chak Bhanga Madhu phase) may have given an impression that Manoj would take Bijon's way - with its elemental presentation of birth, death, hunger and existence with a comic use of dialects - but soon Manoj forged his own way."[8]

'চাক ভাঙা মধু' নাটকে কৌতুকের কিছু উপাদান থাকলেও এই পর্যায় পর্যন্ত মনোজ মিত্র মুখ্যত serious এবং কোথাও কোথাও ক্রোধী। ক্রমে seriousness-কে তিনি আবৃত করেছেন রঙ্গ-কৌতুকের আবরণে, ক্রোধকে রূপান্তরিত করেছেন শ্লেষ বা ব্যঙ্গে। তবে সহানুভূতি গুণের কারণে ব্যঙ্গের চেয়ে কৌতুকেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ।

পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)-এর খুলনা জেলার ধূলিহর গ্রামে মনোজ মিত্রের শৈশবের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর নাটকের আলোচনায় আমরা দেখেছি, জীবনের প্রতি তিনি তাকিয়েছেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে। তিনি মূলত ক্ষমাপরায়ণ শিল্পী। সব ত্রুটি-বিচ্যুতি-দোষ ঝেড়ে শুদ্ধ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন তাঁর লক্ষ্য। তিনি মানুষকে আরো একবার সুযোগ দেবার পক্ষপাতী। এই স্নিগ্ধ, শান্ত, উদার, ক্ষমাপরায়ণ পরিবেশেই তাঁর মানসিক স্বস্তি, কিন্তু সমাজ-রাজনীতির ক্রূরতা এবং ভণ্ডামি যখন প্রবল, তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ। তাঁর সেই ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের কথাই উল্লেখ করেছেন বাংলা নাটকের ইতিহাসকার ঃ

"মাঝে মাঝে তাঁহাকে একটু বিষণ্ণ কিংবা ক্রুদ্ধ মনে হয়, কিন্তু আবার অন্য সময়ে তাঁহার দৃষ্টি প্রজাপতির মতো হাল্কা ডানা বিস্তার করিয়া রম্য বস্তুর সন্ধানে উড়িয়া চলে। তাঁহার ক্রুদ্ধ মেজাজ বাস্তবের প্রতিহিংসা ও বীভৎসতার মধ্যে কখনো কখনো এক জ্বালাময় রূপ ধারণ করে, কিন্তু মনে হয় ইহা তাঁহার ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি মাত্র। তাঁহার স্বাভাবিক মেজাজ প্রকাশ পায় প্রসন্ন জীবনের উপলব্ধিতে এবং স্নিগ্ধ কৌতুকরসের আস্বাদনায়।"[৫]

এই কৌতুকই তাঁর প্রধান অস্ত্র। সেই অস্ত্রেই তিনি অভ্রান্ত নিশানায় লক্ষ্যভেদ করেছেন।

নাট্যকার মনোজ মিত্র একাধারে অভিনেতা এবং নির্দেশকও। ফলে নাটকের মঞ্চরূপ তাঁর কাছে সবসময়ই স্পষ্ট। বিষয়কে যে উপযুক্ত এবং মনোগ্রাহী শিল্পরূপের আধারে প্রকাশ করতে হয়, নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি সেদিকে বিশেষ সচেতন থেকেছেন। তাঁর নাটক তাই শিল্পবস্তু হিসেবে সার্থক এবং মঞ্চসফল। সিচুয়েশন তৈরি করা থেকে প্লটের বুনন, আঙ্গিকের বিশিষ্টতা থেকে সংলাপ রচনার নৈপুণ্য, চরিত্রের বহুমাত্রিকতা থেকে সংগীত ব্যবহারের বিশিষ্টতা — সব ক্ষেত্রেই তিনি অনবদ্য। ফলে তাঁর নাটক মঞ্চে অনুবাদের সময় অদ্ভুত এক স্বাদুতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ বিশেষ কিছু চরিত্র তাঁর অভিনয়ের গুণেই চিরস্থায়িত্ব পেয়ে যায়। কেবল নিজের দল নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নাটকই যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দল এবং শৌখিন গোষ্ঠীগুলি অভিনয় করে থাকে, তার কারণ শিল্পবস্তু হিসেবে এগুলি সার্থকতার শীর্ষ স্পর্শ করে। উৎপল দত্ত বলেছিলেন ঃ

"নাট্যকারের খুব কৌতুকবোধ থাকা দরকার বলে আমার ধারণা ... সেখানে দর্শকদের প্রথমেই হাসিয়ে দিয়ে তার মনোসংযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব। আর কোন রকমেই সম্ভব বলে আমার ধারণা

> নেই এবং আস্তে আস্তে সেই হাস্যরস করুণরসে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। সেটাকে প্রচন্ড ক্রোধে পরিণত করা যায়।"[৬]

মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে ঠিক এই কাজটিই করেছেন। কৌতুক দিয়ে শুরু করে তারপর নিজের ইচ্ছে মতো পাঠক-দর্শককে নিয়ে গেছেন কখনো তীব্র বিদ্রূপের জগতে, কখনো প্রচন্ড ক্রোধে।

মনোজ মিত্রের নাটকে সমস্যা সমাধানের একটি বিশেষ ধরণ আছে। ভাঙনের একেবারে কিনার পর্যন্ত নিয়ে এসে তিনি নিজেই শিউরে ওঠেন ভাঙনের ভয়াবহতা দেখে। এই ভাঙন রোধের জন্যই তাঁর নিরন্তর প্রয়াস। এটা তাঁর কাছে একধরণের লড়াই। সেই লড়াইয়ে তিনি জয়ী করেন প্রান্তিক মানুষকে, আপাত-গুরুত্বহীন মানুষকে। এই কারণে তাঁর নাটককে অনেকসময় ইচ্ছাপূরণ বলে মনে হ'তে পারে। আসলে 'যা হলে ভালো হয়' এবং 'যা হয়' — সে দুইয়ের মধ্যে অদ্ভুত ব্যালেন্স করতে পারেন তিনি। শরৎচন্দ্রের মতোই তিনি জানেন, বাঙালি পাঠক-দর্শকের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা 'যা হলে ভালো হয়'-এর জন্য। সেখানেই তিনি শেষ পর্যন্ত নাটককে পৌঁছে দেন, কিন্তু আকস্মিকভাবে নয়, বরং সমস্তরকম নাট্যিক শর্ত রক্ষা করে। নাটকের যে পরিণতি তিনি দেখান, তা যে সব সময় বাস্তবে সম্ভব বা প্রত্যক্ষ তা নয়, তবে তিনি পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে এমন কিছু চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টি করেন যাতে তাদের আর অবাস্তব মনে হয় না। এই Poetic Construction-এর কারণে তাঁর নাটক পাঠে বা অভিনয় দর্শনে এক ধরণের স্নিগ্ধ স্বাদুতা সৃষ্টি হয়। সেইসঙ্গে থাকে কৌতুকের অনাবিল প্রস্রবণ। তাঁর নাটকের আকর্ষণ তাই অপ্রতিরোধ্য। মনোজ মিত্র, সুতরাং, সেই নাট্যকার, যাঁকে নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বে বাঁধা যায় না এবং যাঁর আকর্ষণ উপেক্ষা করা যায় না।

১৯৮৫ সালে সোনারপুর কৃষ্টি সংসদের মুখপত্র 'কৃষ্টি'তে একটি সাক্ষাৎকারে মনোজ মিত্র বলেছিলেন ঃ

> "আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে লিখতে চাই, সেটা হলো দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার দীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মত উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে কোন ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি - মানুষের এই সংগ্রামকেই ধরতে চাই।"[৭]

অসহায়, দীন মানুষের এই অনভিজাত সংগ্রামই আজও পর্যন্ত মনোজ মিত্রের নাটকের উপজীব্য। সেই বিষয়কে উপযুক্ত শিল্পরূপের আধারে প্রকাশ তাঁর লক্ষ্য। আরো আগে, ১৯৭৬ সালে চেতনা নাট্যোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন ঃ

> "দেশী-বিদেশী মৌলিক নাট্যরূপ পুরাতনী আধুনিক কিছুতেই আমাদের আপত্তি নেই - Brecht এবং Stanislavsky, realistic অথবা absurd সবরকম form নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও আমরা অরাজী নই, তবে সর্ত একটাই - সেটি 'ঠিক' নাটক হওয়া চাই - এবং আমাদের দেশের মানুষের কাজে লাগা চাই।"[৮]

এই হ'ল মনোজ মিত্রের নাটক সম্পর্কে সার কথা। তিনি নাটক রচনায় নির্দিষ্ট একটি বিষয় চান, যে বিষয় 'দেশের মানুষের মনকে স্পর্শ' করবে, দেশের মানুষের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে এবং সেই বিষয় প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শিল্পরূপের আধার রচনাকে অবশ্যকৃত্য বলে মনে করেন।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) নাট্যচিন্তা - প্রথম বর্ষ - নবম-দশম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৮২

২) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ - চন্দন সেন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩ - এর ভূমিকা

৩) Post 1980 Plays ঃ Bangla - Kumar Roy - Theatre India, পৃ.১০

৪) ঐ, পৃ.৭

৫) অজিতকুমার ঘোষ - বাংলা নাটকের ইতিহাস - অষ্টম সংস্করণ - জেনারেল - ১১৯ - জুন ১৯৯৯ - লেনিন সরণি - কলিকাতা-১৩, পৃ.৪৫৬

৬) উৎপল দত্ত - 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটি রামায়ণ' সংকলনে উৎকলিত। সম্পা.রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - অপেরা - ৬৫ সূর্য সেন স্ট্রীট - কলকাতা-০৯ - শ্রাবণ ১৪১২,পৃ.১২

৭) কৃষ্টি - সোনারপুর কৃষ্টি সংসদের মুখপত্র - সম্পা. সচ্চিদানন্দ চৌধুরী, ডিসেম্বর ১৯৮৫

৮) চেতনা নাট্যোৎসবে মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, ১৯৭৬